:: ১৭তম অন্তর্জাল সংখ্যা ::

৭ই ভাদ্র, ১৪২৮ / 24.08.2021

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

শ্রীঅরবিন্দের যোগ সাধনা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
The Death of a God (দেবতার মৃত্যু)	শ্রীঅরবিন্দ
পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ধর্ম রহস্য	শঙ্করী প্রসাদ বসু
সংবাদপত্রে রামকৃষ্ণের কথা	শ্রী সুধীরকুমার মিত্র
মায়ের আগমনে	শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র
আত্মবীক্ষণ	সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by
Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.
Website: https://www.parthasarathipatrika.com
Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

শ্রীঅরবিন্দের যোগ সাধনা

শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ

সাবিত্রী গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "অধিকতর শক্তিমান এক জাতি এই মর-জগতে আবির্ভূত হবে। প্রকৃতির দীপ্ত শিরে, আত্মার ভূমিতে, অতিমানুষ জীবনরাজ্যের রাজা হবে; পৃথিবীকে করে তুলবে প্রায় স্বর্গেরই সহযোগী ও সমানধর্মী।" এ কথা চিন্তা করলে আশ্চর্য মনে হয় যে, শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসতে দেন নি। ইংরেজ দেশে, ইংরেজ পরিবারে, ইংরেজ স্কুল কলেজে রেখে তাঁকে মনে প্রাণে ইংরেজ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিধাতার লিপি অন্য প্রকার। শ্রীঅরবিন্দ ইংলণ্ডে ভারতীয় মজলিশে যোগ দিয়ে ভারতীয়দের প্রতি বৃটিশের পাশবিক ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করতেন। ঐ সময় হতেই বিপ্লবের বহ্নি জাগে তাঁর অন্তরে।

বরদার মহারাজা শ্রীঅরবিন্দের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে, তাঁকে নিজের রাজকার্যে নিযুক্ত করলেন। তখন তিনি ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃত ভাষা নিয়ে তন্ময় হলেন। রাজনীতির বদলে ধর্মনীতি তাঁর অন্তরে বাসা বাঁধল। তাঁর কাছে ধর্মনীতিই হ'ল রাজনীতির ভিত্তি।

ক্রমে অন্তরের সাড়া পেয়ে তিনি নির্জনতার মধ্যে যোগ-সাধনায় ব্যাপৃত হলেন। শ্রীঅরবিন্দের নির্জনবাসকে ভুল বুঝে কোন সমালোচক বলেছেন, তাঁর যোগ সাধারণ মানুষের জন্য নয়।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগ সাধনাকে পূর্ণযোগ বলেছেন। শ্রদ্ধেয় দিলীপ রায়কে তিনি লিখেছেন, "এর লক্ষ্য হল আমাদের দৈহিক প্রকৃতিসহ চেতনা ও সত্তার

DO NOT COPY

সামগ্রিক ও মৌলিক রূপান্তর। এ খুবই চেষ্টা সাপেক্ষ এবং প্রতিপদে বিপদে পরিপূর্ণ।"

শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে আরো বলেছেন, "জীবনকে অস্বীকার করা আমার লক্ষ্য নয়। জীবনকে আত্মার আলোকে রূপান্তরিত করতে হবে। বাস্তব জীবন থেকে পলায়ন করা আমার লক্ষ্য নয়। আত্মার জন্য বস্তুকে জয় করতে হবে। দেহকে বন্ধন বা বিঘ্ন মনে না করে সচেতন ও ত্রুটিহীন যন্ত্রে পরিণত করতে হবে – এই হল আমার যোগ সাধনার প্রধান অঙ্গ।"

শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের সার্থকতা হল মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশে। তিনি নিজে বলেছেন, এ যোগ কিছু নূতন নয়। যোগ সাধনার চার রকম পথ – রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ। এই যোগ চতুষ্টয়ের সমন্বয় করে তার সঙ্গে তিনি যুক্ত করলেন শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ এই সমন্বয় যোগের কথা গীতাতে বলেছেন, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সঙ্গে শক্তি চাই। সাধনা সব দিক দিয়ে পূর্ণ হলেই পূর্ণযোগ হয়। অন্যান্য যোগের মত এতে ধ্যানও আছে। কিন্তু আরও ছয়টি বৈশিষ্ট্য এতে দেখা যায়।

১। রূপান্তর (Transformation) – একে পূর্ণযোগ বলার কারণ হল – এর দ্বারা সাধকের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ পরিণতি আসবে। আগে যোগীরা মনের দিক ধরেই যোগ সাধনা করতেন। দেহটাকে খোলসমাত্র মনে করা হ'ত। তাই নেতি নেতি বিচার এবং চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগ বলা হত। এতে মনের উন্নতি হলেও এবং ভগবানের চেতনার অনুভূতি পেলেও, দেহ ও প্রাণের কোন পরিবর্ত্তন হ'ত না। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, দেহ ও প্রাণ তুচ্ছ নয়। সবই ভগবানের সৃষ্টি। সাধকের ভিতর বাহির সবটারই এক দিব্য আমূল রূপান্তর ঘটবে। এ রূপান্তর জড়ের মধ্যেও নিয়ে আসবে চেতনা।

২। গ্রহণ (Acceptance) - সকলেই পূর্ণযোগের সাধনা করতে পারেন। ঘর ছেড়ে বনে বা পর্বতের গুহায় বাস করার দরকার নেই। লেখাপড়া, বিবাহ, সংসার – কিছুতেই এ যোগের পথে বিঘ্ন হয় না। খেলাধূলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, শরীর চর্চা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, যে কোন পেশা সব কিছুই এই যোগের সঙ্গে চলতে পারে। যোগ মানে বাহ্য-সন্ন্যাস নয়। বাহ্য অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করতে হবে না। পরিবর্ত্তন করতে হবে শুধু অন্তরের অবস্থা।

৩। প্রত্যাখ্যান (Rejection) – পূর্ণযোগ অভ্যাস করতে হলে মন থেকে কতকগুলো বিষয় প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কামনা, লোভ, ক্রোধ, ভয়, হিংসা অহঙ্কার প্রভৃতি। এগুলি আমাদের মনে বিকার সৃষ্টি করে। ফলে আমাদের চিন্তায় শ্রদ্ধা, ভক্তি বা কোন উচ্চ ভাব প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। সেজন্য ওগুলোকে চিন্তার মধ্যে আনতে দিতে নেই। সব থেকে বিপদ সৃষ্টি করে অহঙ্কার, তেমনই অভিমান। সব কিছু 'আমার' এই ভাব একটি ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। এমনকি, এই দেহ-মনও আমার নয়, বাড়ী ঘর, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব তো দূরের কথা। অবশ্য সবই ভগবানের জেনে সবই আমাদের প্রিয় ও প্রত্যেকের প্রতি কর্তব্যও পালনীয়। তেমনই কোন কামনা, ক্রোধ বা চিন্তা আমাদের নিজস্ব কিছু নয়। বাইরের প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গ আমাদের চিত্তে উদ্ভাসিত হয় মাত্র। এই অবাঞ্ছিত বহিরাগতদের অন্তরে প্রবেশ করতে না দিলে আর অহঙ্কার বিকৃত করতে পারে না। আমাদের আত্মা দ্রষ্টা ও সাক্ষীমাত্র।

এর জন্য দরকার মনোবিশ্লেষণ (Analysis of mind)। অন্তরে লক্ষ্য করলে আমরা দেখব আমাদের মধ্যে ২টি পৃথক সত্তা। একটি কাজ করতে চায়, অপরটি কাজ দেখতে চায়। সাংখ্য এই কাজ করার সত্তাটিকেই বলেছেন 'প্রকৃতি'। আর দেখার সত্তাটিকে বলেছেন 'পুরুষ'। এই ২টিকেই আলাদা করতে হবে। প্রকৃতি কাজ করুক। পুরুষ নির্বিকার সাক্ষীচৈতন্য হয়ে থাকুক। প্রকৃতির দোষ পুরুষ ধরে ফেলবে। প্রকৃতি ব্যস্ত হলে পুরুষ থাকবে অবিচল। এইভাবে পুরুষ যখন প্রাধান্য লাভ করবে, তখন প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে। এবং পুরুষ বা আত্মা দ্বারা পরিচালিত প্রকৃতি নির্ভুল ভাবে কাজ করবে। তখন সব কাজই ভগবানে সমর্পণ করা সম্ভব হবে।

৪। আস্পৃহা (Aspiration) – সর্বদা মনের মধ্যে একটি আকুতি বা আকাঙ্খা জাগিয়ে রাখতে হবে। মনের মধ্যে এমন এক চেতনা, এমন এক প্রজ্ঞা জেগে উঠুক যার দ্বারা অন্তরে চৈতন্যময় ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু এই চেতনা ভগবানের কৃপা ব্যতীত জাগে না। ভগবানের এই কৃপাকে শ্রীঅরবিন্দ Divine grace (দৈবী করুণা) বলেছেন। ভগবানের এই করুণা সবার মধ্যেই বর্ষিত হচ্ছে। তবে হৃদয় দিয়ে এই কৃপা আস্বাদন করতে হবে। কৃপা আস্বাদন করতে সাধককে প্রস্তুত হতে হবে। আহারে-বিহারে, নিদ্রায়-জাগরণে সর্বদা এই চেতনা জাগানোর আকুতি থাকলে একদিন তা জাগবেই।

৫। বিশ্বাস (Faith) ও ঐকান্তিকতা (Sincerity) – ভগবানের কৃপা পাবার জন্য বিশ্বাস ও ঐকান্তিকতা দরকার। কেবল ভগবানে বিশ্বাস যথেষ্ট নয়। বিশ্বাস করতে হবে তিনি আমাদের মধ্যে সদা সচেতন ও জাগ্রত। আমাদের মনের সকল কথাই তিনি জানেন এবং সকলের প্রতিই তাঁর দৃষ্টি আছে। অইকান্তিক ভাবে যে তাঁকে চায়, সে তাঁকে পায় এই বিশ্বাস। অবশ্য এই বিশ্বাস স্থায়ীভাবে আনা খুব শক্ত। কোন মহাপুরুষের উপদেশে হয়ত সাময়িক ভাবে বিশ্বাস আনতে পারে। কিন্তু দুঃখ কষ্ট বা বিপদে পড়লেই বিশ্বাস থাকে না। কিন্তু বিশ্বাস সুদৃঢ় হওয়া চাই।

বিচার বা বিতর্কের আঘাতে বিশ্বাস ও ঐকান্তিকতাকে হারিয়ে ফেলা চলবে না। বিশ্বাসের স্থান যুক্তির চেয়ে বড় বলে জানতে হবে। সব অবস্থাতেই এই বিশ্বাস সুদৃঢ়ভাবে রাখা চাই।

৬। আত্মসমর্পণ (Surrender) – বিশ্বাস ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে ভগবানে আত্মসমর্পণ থাকা চাই। আত্মসমর্পণ পূর্ণযোগের শেষ কথা। সেইজন্য এই পূর্ণযোগকে আত্মসমর্পণ যোগও বলা যায়। আত্মসমর্পণ করা খুবই কঠিন। অহঙ্কারের লেশমাত্র থাকলে তা হয়না। আত্মসমর্পণ যোগই শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। গীতায় বলেছেন, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" সকল ধর্মাধর্ম ত্যাগ করে আমারই শরণাপন্ন হও। শ্রীঅরবিন্দের যোগ গীতার এই যোগেরই নামান্তরমাত্র। নিজের সকল অধিকার বোধ ত্যাগ করতে হবে। ভগবানের অসীম শক্তিই আমাদের মধ্যে কাজ করছে। আমরা ভগবানের হাতের যন্ত্রমাত্র। এইভাবে ভগবানের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ একে বলেছেন opening এবং আলোয় আলোয় যাবার পথ (সূর্যকিরণোজ্জ্বল পথ)।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "ব্যক্তিগত কোন মহত্বলাভের জন্য আমি এই অতিমানস চৈতন্যকে নামিয়ে আনছি না। মানবিক দৃষ্টিতে যাকে মহত্ব বলে আমি তাকে গ্রাহ্যই করি না। অন্তরস্থ সত্য, আলোক, সমন্বয় ও শান্তির নীতিকে পার্থিব চেতনার মধ্যে নামিয়ে আনতে চাই।" সমগ্র মানব সমাজ যাতে সেই দিব্যচেতনার অধিকারী হতে পারে, তিনি সেই চেষ্টাই করেছেন। তাঁর ঐ তপস্যার প্রভাবে পৃথিবীও একদিন সেই দিব্য চেতনায় উন্নীত হবে। তিনি জগত থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি পছন্দ করেন নি। তিনি বারবার বলেছেন, এই পৃথিবীতেই তিনি সার্থক ও শান্তির জীবন চান। সাবিত্রীতে বলেছেনঃ "পৃথিবীই হল বলিষ্ঠ আত্মার বাসস্থান। পৃথিবীই বীর আত্মার সংগ্রাম ক্ষেত্র।"

তাঁর এই উক্তিতে পৃথিবীর মানুষেরই মহত্ব স্বীকার করা হয়েছে। তাই শ্রীঅরবিন্দ যোগী হলেও এই মাটীর পৃথিবীরই যোগী।

The Death of a God (দেবতার মৃত্যু) **শ্রীঅরবিন্দ**

নিভিয়ে ফেল চিতার আগুন, এখন উঠে দাঁড়াও!
দিব্য দেহের ভস্মরাশি তারায় তারায় বিলাও!
আশার মুকুল ছিন্ন কর, আস্পৃহা যাক মরে,
বন্দীশালা রাঙ্গাও, তার গরাদ বাঁধো জোরে।

এই ত দেখো তিনি এখন মৃত্যু-কবলিত,
মহত্ব যাঁর বিশ্বভুবন করি প্রপীড়িত,
স্বর্ণ ছায়ায় মিলিয়ে গেল যুগের বেদন-পথে,
সেই মহাতেজ দিব্যাকাঙ্খা লুপ্ত ধরা হতে ।

তাঁর সুতীব্র প্রভায় যারা গিয়েছিল সরে,
তাঁহার আলোক মাধুরিমা হতে লজ্জা ভরে,
আসছে ফিরে এখন তাঁরা আঁধার গরিমায়
বিষাদ ভরা প্রাণ-প্রদাহের নিঠুর বেদনায় ।

মিথ্যা যে সব, অপকৃষ্ট, ক্ষিপ্ন অতিশয়,
আপন পথে চলবে তারা একান্ত নির্ভয় ।

মুছে ফেল দীপ্ত যুগের গৌরব ইতিকথা,
ফিরিয়া দাও জীবনকে তার সকল বেদন-ব্যথা।
অবনত নীরস প্রাণের আরাম ফিরে নাও
ধরার ধূসর মলিনিমার পানে এখন চাও ।।

DO NOT COPY

পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

শ্রীপ্রীতিকুমারের লেখা চিঠিগুলি দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমাদের ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যম ছিল এই চিঠিগুলি। এক জায়গায় গুছিয়ে বসে সংসার করা তাঁর হয় নি। একটি সম্পূর্ণ দিনও তিনি আমাদের জন্য দিতে পারেন নি। তাই বরানগর থেকে শ্যামবাজারের মধ্যেও চিঠি লিখতে হোত। সারাজীবন ধরে এত বিভিন্ন লোকের সাথে মেলামেশা করতেন, আমাকেও তার হ্যাপা পোহাতে হোত। মনে হোত খাল কেটে আরেকটি কুমীর নিয়ে এলেন। অল্প বয়সে শ্রীপ্রীতিকুমারকে সামনা সামনি কিছু বলতে পারতাম না। একটি চিঠি লিখে বসে থাকতাম। আমার যদি মনে হোত কারও ব্যবহারটা ঠিক হয়নি, আমি তাঁকে তৎক্ষণাৎ লিখে জানিয়ে দিতাম। এখনও অনেকের কর্তৃত্ব, চলা ফেরা আমার ভালো লাগে না। মনে মনে draft করে ফেলি। কিন্তু ছেলের জন্য আর লেখা হয়ে ওঠে না। এখন মনে হয় সে সময়ে হয়ত শ্রীপ্রীতিকুমার ঠিকই বলতেন, রেগে গেলেই চিঠি লিখে ফেলা ঠিক নয়।

অভিন্নহৃদয়েষু,

মঙ্গলবার রওনা হচ্ছি। বুধবার পৌঁছাব। ভবিষ্যতের কিছু সুরাহা হোল মনে হয়। এতদিনে সত্যকারের আলো দেখা যাচ্ছে। বিস্তারিত সব সাক্ষাতে বলব। যদি এই আলো থাকে, তবে তোমার ও বাবুর বিলেত যাওয়া নিশ্চিত জানবে।

পবনবাবুকে বোল 'পার্থসারথি' ইংরাজী ও বাংলা যেন সব compose করে রাখেন। আমি যাবার পর যেন ছাপা হয়। আগেই যেন ছেপে না ফেলেন।

বাবুকে আদর দিও। তুমি আমার আদর জানবে।

ইতি
প্রীতিকুমার
১৮/১০/৬৩

প্রিয় শ্বেতা,

মানসের চিঠিটা পাঠালাম। চিঠির ভাষা নিশ্চয়ই ভালো হবে না। হওয়া আশা করাও যায়না। এই সব চিঠি লেখালেখিতে অপবাদ ও কলঙ্ক ছড়ায়, তাছাড়া অশান্তিও হয়। এটা তোমার জানা উচিত। আমি এসব ধরণের কাজ

একদম পছন্দ করিনা। তোমাকে চিরকাল বলে আসছি বাইরের কাউকে চিঠি দেবে না, যদি দিতেই হয় আমাকে না দেখিয়ে কখনও চিঠি লিখবে না। এটা চিঠি লেখার স্বাধীনতা হরণ নয় – তোমার ধৈর্যহীনতা নিয়ে লেখা চিঠি কারও ক্ষেত্রে শুভ হবে না। সামান্য বিষয় নিয়ে তুমি উত্তেজিত হয়ে পড় কেন? আমি যে কথা বলি ও ভাবি তার ভবিষ্যত ভাববে ও বিচার করবে, তাহলে আর আমাদের কলঙ্কিত হতে হবে না। এই সব চিঠি থেকেই মানুষের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। আমি জীবনে যে কাজ তোমাকে করতে নিষেধ করেছি বা করছি, তা তুমি কোনও অবস্থায় করবার জন্য তৈরি হবে না। উত্তেজিত হয়ে, চঞ্চল অবস্থায় যে কাজই করা হোক না কেন, তার ফল শুভ হতে পারে না।

শুভেচ্ছা রইল।

প্রীতিকুমার
24.01.64

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ধর্ম রহস্য **শঙ্করী প্রসাদ বসু**

তাহলে ধর্ম কোথায়?

স্বামী বিবেকানন্দের উত্তর – ধর্ম তোমারই মধ্যে। ঈশ্বর তোমারই মধ্যে। তুমি যদি কীটও হও, তবু তুমি ঈশ্বর। কেউ বেশী ঈশ্বর, কেউ কম ঈশ্বর। কেউ বেশী প্রকাশিত, কেউ কম প্রকাশিত। চরম প্রকাশের নাম যদি ঈশ্বর হয়, খানিক প্রকাশও ঈশ্বর না হয়ে যায় না।

কিন্তু আমরা নিজেকে ঈশ্বর বলে অনুভব করি না কেন?–অজ্ঞানই তার কারণ। অজ্ঞানের অপর নাম মায়া।

মায়া কিভাবে অতিবড় সত্তাকেও আচ্ছন্ন করে রাখে তা স্বামীজি দেবর্ষি নারদের মতিভ্রমের এক উপাদেয় গল্প দিয়ে বুঝিয়েছিলেন।–

কৃষ্ণের কাছে গিয়ে নারদ বললেন, 'প্রভু মায়া কাকে বলে আমাকে বুঝিয়ে দিন।' কৃষ্ণ তখন হাঁ–হুঁ কিছু করলেন না। কয়েকদিন পরে কৃষ্ণ নারদকে বললেন, 'চলহে, বেড়িয়ে আসা যাক।' যেতে যেতে তাঁরা এক মরুভূমিতে পৌঁছিলেন। সেখানে কৃষ্ণের তৃষ্ণা পেল। তিনি নারদকে বললেন, 'নারদ, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, জল খাওয়াতে পারো?' 'এখনি জল নিয়ে আসছি প্রভু'–বলে

নারদ ছুটলেন। কিছুদূর গিয়েই দেখেন একটা গ্রাম। সেখানে যে বাড়ী পেলেন, তার দরজায় নারদ ধাক্কা দিলেন। দরজা খুলে দিল অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী– তাকে দেখেই নারদের মাথা ঘুরে গেল। মরি মরি! কে গো তুমি!

কোথায় রইল কৃষ্ণ আর তার তেষ্টা! কৃষ্ণ হয়ত তেষ্টাতে শুকিয়ে মরছেন, মরুক–গে, নারদের সেসব কথা ভাবার অবসর নেই – সামনে ভর যুবতী – সাক্ষাৎ কর্তব্যরূপে নারদ তার সঙ্গে রসালাপ শুরু করে দিলেন। যুবতীও সাড়া দিল ভাল মতো। ব্যাপারটা ভালবাসায় দাঁড়িয়ে গেল। নারদ যুবতীর পিতার কাছে কন্যার পাণি–প্রার্থনা করলেন, তা মঞ্জুর হল, বিয়ে সাদি হয়ে গেল, ছানাপোনাও হল ক্রমে ক্রমে। বার বছর বড় সুখে কাটল। তারপর বর্ষাকালে প্রলয়ঙ্কর বন্যা এল গ্রামে। বাড়িঘর হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল – গরু বাছুর–মানুষ সব ভেসে বা ডুবে গেল বন্যার তোড়ে। নারদেরও একই হাল। প্রাণপণে তিনি এক হাতে পত্নীকে ধরে রইলেন, অন্য হাতে ধরলেন দুই শিশুকে, কাঁধেও রইল একটি শিশু। বন্যার মধ্যে তিনি নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে এগোবার চেষ্টা করতে লাগলেন। হঠাৎ এক জলের তোড় এসে তাঁর কাঁধের শিশুটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তার জন্য নারদ হায় হায় করবার সময়ও পেলেন না, কেননা আর এক ঢেউয়ের ধাক্কায় ছিটকে বেরিয়ে গেল বাকি দুইটি শিশু। রইল পড়ে বউটি। তাকে আঁকড়ে রইলেন প্রাণপণে। কিন্তু পরবর্তী প্রচণ্ড এক ঢেউ সেই প্রাণতুল্যা প্রেয়সীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, আর অন্য ঢেউ নারদকে অনেক উঁচু ডাঙ্গায় ছুঁড়ে তুলে দিল। সেখানে নারদ শোকে দুঃখে আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদতে লাগলেন। কাঁদছেন – কাঁদছেন – এমন সময়ে অতি স্নিগ্ধ মধুর কন্ঠস্বর শুনলেন নারদ। 'বৎস, আমার তেষ্টার জলের কি হল?' নারদ তাকিয়ে দেখেন, প্রভু কৃষ্ণ মিটি মিটি হাসছেন। নারদের ঘোর তখনো কাটেনি। জিজ্ঞাসা করলেন– 'কি বললেন?' কৃষ্ণ পূর্ববৎ মধুস্বরে বললেন, 'কি নারদ, আধঘন্টা হয়ে গেছে – এখনো জল দিলেনা?' 'আধ ঘন্টা' – নারদ ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন – 'নাকি বারো বছর?' – নারদের মাথা আবার গুলিয়ে গেল। কৃষ্ণ বললেন, 'মায়া, বৎস, মায়া!'

একই ধরণের আর একটি গল্প স্বামীজি বলেছেন।

অসুর নিধনের জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে একবার শূকররূপ ধরতে হয়েছিল। তিনি শূকররূপে পাতালে গিয়ে কাদা পাঁকের মধ্যে বাস করতে লাগলেন। অসুর মারা হল, কিন্তু তারপর ইন্দ্র পাঁকের জগৎ ছেড়ে আসতে পারলেন না, কারণ তাঁর শূকরী জুটে গিয়েছিল এবং উক্ত শূকরী ইন্দ্রাণী শূয়োরের পাল পেটে

ধরেছিলেন। তিনি বেশ সুখে আছেন, ওধারে নেতৃহীন দেবতারা দুশ্চিন্তায় কাতর। তারা ইন্দ্রের কাছে ছুটে এসে বললেন, 'মহারাজ একি করছেন!' আপনি আমাদের অধিপতি, আপনার শাসনে আমরা বাস করি – আপনি স্বয়ং দেবরাজ – আপনি পাঁকে পড়ে থাকবেন?' ইন্দ্র বললেন, 'আমি ওসব জানিনা, স্বর্গ চাই না, এখানে বেশ আছি। আমার এই প্রেয়সী শূকরী আর আদুরে বাচ্চাগুলি থাকলে অন্য কিছুর দরকার নেই।' দেবতারা দেখলেন মহা বিপদ। এখন দেবরাজকে যেভাবে হোক পঙ্ককুন্ড থেকে উদ্ধার করতে হবে। তাঁরা অতঃপর শুয়োরের বাচ্চাগুলিকে একে একে নিকেশ করতে লাগলেন। সব কটাকে মেরে ফেলার পরে তাঁরা ইন্দ্রের শূকরী প্রেয়সীকেও সাবাড় করলেন। তাতেও ইন্দ্রের পাঁকে লুটোপুটি থামল না। অগত্যা তাঁরা স্বয়ং ইন্দ্রের শূকর দেহটিকে কেটে খন্ড খন্ড করে ফেললেন। ফলে ইন্দ্র খাঁচাছাড়া হয়ে পড়লেন, এবং হাসতে লাগলেন – 'কী কাণ্ড! কী মায়া! কী স্বপ্ন! কী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন! – আমি দেবরাজ ইন্দ্র – আমি কিনা শূকর জন্মকে একমাত্র জন্ম ভাবছিলাম! শুধু তাই নয়, চাইছিলাম যে, সমস্ত জগৎ শূকর জগৎ হয়ে যাক!!'

এই স্বপ্ন, এই মায়াই মানুষকে আপেক্ষিক জগতে আবদ্ধ রাখে। পাপ মায়ারই অপর রূপ। এই মায়াকে ছিন্ন করতে না পারলে মানুষ তার নিত্য স্বরূপ লাভ করবে না। ধর্মের যে ভাষ্য আপেক্ষিকতাকে চরম সত্যের মূল্য দিতে চায়, স্বামীজি তাকে কখনো নিত্য ধর্ম বলে স্বীকার করতে পারেন নি। 'আমার ধর্মই একমাত্র সত্য' যে বলে, সে নিতান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। "একটা মানুষ দুটি-তিনটি মতবাদ হাজির করে দাবি করে – তার ধর্ম সমগ্র মানব সমাজকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে। ঈশ্বর সার্কাসের এই মালিক নিজের ক্ষুদ্র খাঁচাটি হাতে করে পৃথিবীতে বেড়িয়ে পড়ে, বলে, "ঈশ্বর, মানুষ, জীব, জন্তু- সবাইকে এর মধ্যে ঢুকতে হবে। তার জন্য মোটা হাতিটাকে যদি কেটে টুকরো টুকরো করতে হয়, তাও সই।"

স্বামীজির কথা শুনে আমাদের স্বতঃই সেই দৈত্যটির কথা মনে পড়ে, আগন্তুকদের ভূরিভোজে আপ্যায়িত করে যে শুতে দিত আরামের খাটে। তারপর দেখত অতিথি মহাশয় বিছানার চেয়ে মাপে ছোট কি না? যদি ছোট হত- টেনে লম্বা করে দিত তাকে বিছানার মাপে, যদি লম্বা হত – ছেঁটে সমান করে দিত অবশ্যই।

যারা বলছে, আমার ধর্মই একমাত্র সত্য, তারা যে নিজের মাপেই তার ভগবানকে মাপছে, সেকথা ভুলে যায়। স্বামীজি এক্ষেত্রে মোটেই মনোরম দৃষ্টান্ত

দেন নি যখন তিনি বলেছেন, "মোষ যদি ঈশ্বরের উপাসনা করতে চায়, সে ভগবানকে অতিবৃহৎ এক মোষ রূপে কল্পনা করবে, তেমনি মাছও ভগবানকে ভাববে সুবৃহৎ মৎস।" না, স্বামীজি কেবল বিদ্রূপ করবার জন্যই ঐ তুলনাটি দেন নি। তিনি সত্যকেই প্রকাশ করেছিলেন। "ধরা যাক মানুষ, মহিষ এবং মৎস্য এক একটি জলযানের আকার ধারণ করে ঈশ্বর-সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হল - নিজ সাধ্যানুযায়ী ঈশ্বরবারি আহরণের জন্য। ঈশ্বরবারি অতঃপর মানুষ-তরীতে মানুষের আকার নিল, মহিষ-তরীতে নিল মহিষের আকার এবং মৎস্য-তরীতে মৎস্যাকার।"

কিন্তু মানুষ, মহিষ বা মৎস্য কেউ কি দাবি করতে পারে - সে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পেরেছে?

আশি বছরের এক বৃদ্ধ একদা স্বামীজিকে বলেছিলেন - তিনি ভগবানকে মেঘের উপর উপবিষ্ট দীর্ঘ দাড়িযুক্ত বৃদ্ধ ছাড়া ভাবতে পারেন না। মানুষের স্বর্গ কল্পনার মূলেও রয়েছে এই ধরণের সীমাবদ্ধ কামনা-বাসনার প্রতিফলন। মরুভূমির দেশ আরবে জলের বড়ই অভাব, ফলে সেখানে গাছপালা প্রায় নেই। সুতরাং মুসলমানদের স্বর্গ এমন একটা জায়গা সেখানে চমৎকার বাগান আছে, তার পাশ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। মুসলমানের স্বর্গ জলে ভর্তি। স্বামীজি অতঃপর বলেছেন, আমি জলের দেশের মানুষ। সুতরাং স্বর্গ কল্পনার সময়ে আমি শুকনো একটা জায়গার কথা অবশ্যই ভাবব। খ্রীষ্টানরাও তেমনি ভাববে নিজেদের মনোমত কিছু।

মানুষ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কিভাবে বস্তু দর্শন করে, তাকে অন্য দৃষ্টান্তেও স্বামীজি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে পাদ্রী এবং তরুণী। চাঁদের কলঙ্ক-চিহ্নগুলিকে পাদ্রীর মনে হল গির্জার চূড়া, আর তরুণীর মনে হল মুখ-চুম্বনরত প্রেমিক প্রেমিকা।

'যদি আমি দোকানদার হই, আমি ভাবব দোকানদারিই পৃথিবীর একমাত্র উচিত কর্ম; যদি চোর হই, তাহলে চুরি তাই; ডাকাত হলে ডাকাতি।' মানুষ আবদ্ধ হয়ে আছে তার বুদ্ধি সীমায়। সেইসঙ্গে সবাই চায় অপরে তার গণ্ডীভুক্ত হোক। এই সূত্রে স্বামীজি একটি চমৎকার গল্প বলেছেন। গল্পটি তিনি পওহারী বাবার কাছে শুনেছিলেন।

এক বজ্জাত লোক একবার অপকর্মের সময়ে হাতে নাতে ধরা পড়ে। শাস্তি হিসেবে তার নাক কেটে দেওয়া হয়। ছি ছি! বোঁচা মুখ! লোকটার নিজের উপর ঘেন্না ধরে গেল, সে দুঃখে লজ্জায় পালিয়ে গেল বনের মধ্যে।

সেখানে সে সাধু সেজে বাঘের চামড়া বিছিয়ে বসে রইল। যখনই কারও সাড়া পায় অমনি চোখ বুজে খাড়া হয়ে থাকে–যেন গভীর ধ্যানমগ্ন। সে ভেবেছিল, কেউ আর তার দিকে তাকিয়ে দেখবে না। কিন্তু ফল হল উল্টো। মহাসাধু মনে করে ক্রমে বহু লোক তাকে ভক্তি করতে আরম্ভ করে দিল। ফলে তার আরণ্য জীবন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে গেল। বহু বছর এইভাবে কাটল। এত বছরেও সাধু মুখ খোলেনি, পাছে কথা বললেই ধরা পড়ে যায়। এধারে কিন্তু মৌনী ধ্যানী সাধু সম্বন্ধে লোকজনের কৌতূহলের অন্ত নেই, বিশেষতঃ একটি ছোকরা তো নাছোড়বান্দা। সে সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে সাধু হতে চায়। ছোকরার তাগিদে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, সাধুর মুখ না খুললে নয়। একদিন বাধ্য হয়ে নীরবতা ভেঙ্গে সে ছোকরা ভক্তটিকে বলল, আগামীকাল সকালে একটা ধারালো ক্ষুর নিয়ে আসবে – তোমার দীক্ষা হবে। ছোকরার আনন্দের সীমা নেই। এতদিনে তার আশা পূরণ হবার মুখে। প্রভু মুখ খুলেছেন – তিনি এবার তাকে নিজের সম্প্রদায়ে গ্রহণ করবেন। পরদিন মহানন্দে সে ক্ষুর হাতে সাধুর কাছে হাজির হল। সাধু তাকে হাতে ধরে এমন গভীর বনের মধ্যে ঢোকালো যেখানে কোন লোকজন আসার সম্ভাবনা নেই। তারপর একহাতে যুবকের ঘাড় ধরে অন্য হাতে ক্ষুর নিয়ে দ্রুত এক টানে ঘ্যাচ্ করে তার নাক কেটে ফেলল, এবং অতি গম্ভীর স্বরে বলল, 'বৎস, এই আমার দীক্ষারীতি। আমি এইভাবেই সম্প্রদায়ে ঢুকেছি। তোমাকেও ঢোকালাম। ভবিষ্যতে সুযোগ এলে তুমিও সযত্নে এই দীক্ষা দিয়ে শিষ্য সংগ্রহ করবে।'

ছোকরার নাক কাটা গেল, লজ্জায় মাথা কাটা গেল। কিন্তু ব্যাপারটা ভাঙতেও পারল না। সুতরাং পরবর্তীকালে সেও সাধ্যমত এই পদ্ধতিতে দীক্ষা দিয়ে যেতে লাগলো। তার ফল – একটা পুরো নাক–কাটা ধর্ম সম্প্রদায়ের আবির্ভাব।

'ইনস্পিরেশন' বা প্রেরণার দাবি অনেকেই করে থাকেন – কিন্তু সত্য আর মিথ্যা প্রেরণা চেনার উপায় কি? স্বামীজি বলেছেন, লক্ষ্য করবে – প্রেরণার আগের মানুষ আর পরের মানুষের মধ্যে তফাৎ কতখানি। মনে রাখবে – সমাধি ও নিদ্রার মধ্যে যে–তফাৎ, সত্য ও মিথ্যা প্রেরণার মধ্যে সেই তফাৎ। কোন হতভাগা আহম্মক দিব্যি লম্বা একটা ঘুম মারল – ঘুমের আগে সে যা ছিল, ঘুমের পরেও সে তাই রইল। কিন্তু সমাধির সমুদ্র থেকে যিনি উঠে এলেন তিনি ভিন্ন মানুষ – পূর্বের আকার তাঁর নেই – তিনি এখন নবজন্মের দিব্য

পুরুষ। প্রেরণার দিব্যদাহের পূর্বে যিনি ছিলেন নাজারেথের যীশু, তিনি পরে হলেন যীশুখ্রীষ্ট!

স্বেচ্ছানিযুক্ত প্রফেটদের একজন, তিনি বোষ্টন-শহরবাসী, স্বামিজীর কাছে এসে বললেন, তিনি এক ভিশন্ লাভ করেছেন, যার মধ্যে হিন্দু ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলা হয়েছে। স্বামিজীকে ভিশন্-এর সত্যতা বিশ্বাস করতেই হবে- প্রফেট দাবি করলেন। স্বামিজী বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, তবে কিনা একটু যাচাই করা দরকার। তোমার ঐ ভিশনের হিন্দু ভাষাটা লিখে দাও দিকি। ভদ্রলোক এক কাঁড়ি আজে বাজে কথা লিখে দিলেন, যার বিন্দু বিসর্গ স্বামিজী বুঝতে পারলেন না। তখন স্বামিজী বললেন, 'আমার যতদূর জ্ঞানগম্যি, তাতে এরকম কোনও ভাষা ভারতবর্ষে বলা হয়নি, ভবিষ্যতে হবেও না।' বলা বাহুল্য ঐ প্রফেট স্বামিজীকে সন্দিগ্ধ পাষন্ড ছাড়া কিছু ভাবতে পারেনি।

এইরকম অনেক বাণী নিয়েই অনেকে হাজির হন, তাঁদের অনেকে 'সর্বশক্তিমানের সাক্ষাৎ মুখপাত্র'। নানা বিচিত্র বক্তব্য তাঁদের, এবং প্রত্যেকটি বক্তব্যই সত্যনন্দনের বাবা। স্বামিজী জনৈক 'হনস্ বাবা' সম্বন্ধে লিখেছেন তীব্র বিদ্রূপ ও কৌতুকের সঙ্গেঃ

"বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে তোমার কেমন মনে হল? নিশ্চয় চন্দ্রদেবতা ও সূর্যদেবতাসহ বিরাজমান 'হনস্ বাবা'র মত তিনি ষ্টাইলিশ নন! অন্ধনিশায় যখন অগ্নিদেবতা, সূর্যদেবতা ও তারকা দেবীরা ঘুমিয়ে থাকেন, তখন কে তোমার অন্তরলোককে আলোকিত করে? আহা, 'আলোকের বার্তা' নামক তত্ত্বটি কি মহান! এই মতটির অভাবে জগৎ যুগ যুগ ধরে কী অন্ধকারেই না পড়েছিল! বুদ্ধ, কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট প্রভৃতির যত জ্ঞান, ভালবাসা আর কাজ - সব বৃথা, বৃথা তাদের জীবন - কারণ তাঁরা তো 'রাত্রিকালে সূর্য, চন্দ্র যখন gone to the limbo, তখন কে অন্তরের আলোক জ্বালিয়ে রাখে,' তা আবিষ্কার করতে পারেন নি। পরম সুস্বাদু-কি বলো।"

স্বামিজী অবশ্য হনস্ বাবাকে উক্ত আবিষ্কারের পুরো পেটেন্ট এবং উৎপাদন বন্টনের পুরো এজেন্সি ছেড়ে দিতে রাজি হননি। রাত্রে সূর্য চন্দ্র তারকারা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন কে চৈতন্যকে জাগিয়ে রাখে তার একটি মহাকারণ আবিস্কার করে তিনি ভারি খুশি হয়েছিলেন-

"ক্ষুধা-আমার ক্ষুধা! তাই আমার চৈতন্যকে জাগিয়ে রাখে-আবিষ্কার করেছি এক্কেবারে!!"

প্রফেটদের ভাবভঙ্গি সম্বন্ধে স্বামিজীর আরও কিছু তেতো কথা আছে-

"মানুষের অবস্থা দেখে যখনই কোনো প্রফেট দুঃখিত হয়ে পড়েন, তখনই তিনি মুখ ঝুলিয়ে লম্বা করেন, বুক চাপড়ান, যে যেখানে আছে সকলকে ডেকে বলেন, তোমরা টক্ খাও, কয়লা চিবোও, সর্বাঙ্গে ছাই মেখে গোবরের গাদায় বসো, আর চোখে জল ও গোঙানির ভাষায় কথা বলো।"

প্রফেটদের মানবপ্রেমের এই কাঁদাকাটা, হাঁচোড়-পাচোড়ে স্বামিজীর আপত্তি এইখানে - এমনিতে মানুষের দুঃখযন্ত্রণার বোঝা এত বেশী যে তাই বইতে তাদের প্রাণান্ত - তার উপর আবার প্রফেটদের বিলাপ ও অভিশাপের বাড়তি বোঝা! "তোমার জ্বালা যন্ত্রণা দিয়ে আমাদের এমন শঙ্কিত করে তুলো না যে, শেষে আমাদের মনে করতে হয় - তোমার কাছে না এসে নিজের দুঃখের বোঝা নিয়ে থাকাই বরং আমাদের ভাল ছিল। যে ব্যক্তি সত্য সত্যই জগতের দায় ঘাড়ে নেয়, সে জগতকে আশীর্বাদ করতে করতে আপন পথে চলতে থাকে। যিনি পরিত্রাতা তাঁকেই সানন্দে চলতে হবে নিজের পথে - যারা ত্রাণ পাচ্ছে, দায় তাদের নয়।"

কারণ যাঁরা পরিত্রাতা, তাঁরা সুখ-দুঃখের, জীবন-মৃত্যুর পারে গিয়েছেন। স্বামিজী দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁদের চরিত্র বুঝিয়েছেন।

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারকে তাঁর শিক্ষক বলে দিয়েছিলেন, ভারতে যদি যাও, সেখানে অনেক জ্ঞানী ঋষি আছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের চেষ্টা করো। ভারতে এসে আলেকজাণ্ডার ঋষির সন্ধান করতে লাগলেন। অনেক চেষ্টায় এক অতি বৃদ্ধ ঋষিকে পেলেন। ঋষি একটা পাথরের উপর বসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আলেকজাণ্ডার খুশি হলেন। বললেন, 'আমার সঙ্গে আমার দেশে চলুন।' ঋষি বললেন, 'না, আমি এই বনে বেশ আনন্দে আছি।' সম্রাট বললেন, 'আমি আপনাকে ধনরত্ন দেবো, মর্যাদা দেবো। আমি হলুম পৃথিবীপতি।' ঋষি বললেন, 'ওসবে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।' তখন সম্রাট চটে উঠে বললেন, 'আপনি যদি না যান, তাহলে আপনাকে মেরে ফেলব।' ঋষি হেসে ফেললেন। বললেন, 'মহারাজ, এবার তুমি সবচেয়ে আহাম্মকের মত কথা বললে। তুমি আমাকে মারতে পারো না। আমি হলুম সেই, যাকে সূর্য শুকোতে পারে না, আগুন পোড়াতে পারে না, তলোয়ার কাটতে পারে না। আমার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। আমি নিত্য সত্য, অনাদি অনন্ত আত্মা।'

এই প্রাচীন ঋষিরা অবশ্যই মূর্খ, কারণ তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে আধুনিকদের সদ্য-জানা জ্ঞানের মিল নেই। স্বামিজী তির্যক ব্যঙ্গের সঙ্গে বলেছেন- 'কিন্তু অন্য একটি নাম ওখানে ব্যবহার করো, বলো যে, হাক্সলি বলেছেন,

টিনড্যাল বলেছেন – তখনই কথাটা সত্য হয়ে পড়বে আর সঙ্গে সঙ্গে সেকথা মেনে নেওয়া হবে। পুরাতন কুসংস্কারের বদলে নতুন কুসংস্কারের নির্মাণ!'

স্বামিজী নূতন পুরাতন যে কোন কুসংস্কারের বিরোধী। পবিত্রতা সম্বন্ধে বিচিত্র ধারণাগত কুসংস্কার তিনি দেখেছেন সর্ব ধর্মের মানুষের মধ্যে। প্রাচীনত্বই অনেক সময়ে পবিত্রতার প্রতিশব্দ। যা অতীতে ধর্মের সঙ্গে কোনক্রমে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল, পরবর্তীকালে সেই ধর্মের মানুষের মহাপবিত্র বস্তু বলে গৃহীত। "আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভূর্জপত্রে লিখতেন; তারপর তাঁরা কাগজ প্রস্তুতের প্রণালী শিখলেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত ভূর্জপত্র পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। প্রায় ন'দশ হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করে যে প্রণালীতে অগ্নি উৎপাদন করতেন, সে প্রণালী আজও বর্তমান – যজ্ঞের সময়ে অন্য প্রণালীতে অগ্নি উৎপাদন চলবে না। হিব্রুদের সম্বন্ধেও এইরূপ। তারা আগে পার্চমেন্ট কাগজে লিখত, এখন তারা কাগজে লিখে থাকে, কিন্তু পার্চমেন্টে লেখা তাদের চোখে মহা পবিত্র আচার বলে পরিগণিত। এইরূপ সকল জাতির সম্বন্ধেই। এখন যেসব আচার শুদ্ধাচার বলে বিবেচনা করছ, তা প্রাচীন প্রথামাত্র।"

ধর্মের কুসংস্কারের বিরোধিতা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের কুসংস্কারের পক্ষপাতী হওয়ার প্রয়োজন স্বামীজি বোধ করেননি একথা আগে বলেছি। তাহলেও তিনি শেষপর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অধিক সার্থকতা স্বীকার করেছেন। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশ্বাস করে এবং বিজ্ঞানের প্রমাণ আসে বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকে। অপর দিকে অধিকাংশ ধর্মের ক্ষেত্রে বাইরের প্রমাণের উপর নির্ভরতা দেখা যায়। কেউ বলেন, জিহোবা এইকথা বলেছেন; কেউ বলেন যীশু একথা বলেছেন; কেউ বলেন মহম্মদ একথা বলেছেন। স্বামিজীর প্রশ্ন –'এটা যদি জিহোবার আদেশ হয়, তাহলে যারা জিহোবাকে জানে না বা মানে না, তাদের কাছে ঐ আদেশ পৌঁছবে কি করে? যদি তা কেবল যীশুরই আদেশ হয়, তাহলে যে কখনো যীশুকে জানেনি, সে কিভাবে ঐ আদেশ পাবে? যদি তা বিষ্ণুর আদেশ হয়, তাহলে উক্ত মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত নন এমন ইহুদি কি করে তা জানবে? স্বামিজীর পরিচিত নন এমন ইহুদি কি করে তা জানবে? স্বামিজীর বক্তব্য – অমুক বলেছেন বলেই কোন জিনিস সত্য হয় না – ওটা বাইরের প্রমাণ – ভিতরের প্রমাণ নয়। জিহোবা–যীশু–মহম্মদ–বিষ্ণুর কথা তখনই সত্য হতে পারে যখন তা সকলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। 'আমরা সবাই মুক্তি পাব; তাই আমাদের নিয়তি; তাকে আমরা চাই বা না চাই।' সুতরাং ধর্মাচার্যরা বলুন বা না বলুন আমরা সবাই নিত্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত।

বাইরের প্রমাণ আর ভিতরের প্রমাণ বলতে স্বামিজী কি বুঝেছেন, তাঁর কথাতেই দেখা যাক–

"কোথাও কোথাও এমন বিশ্বাস আছে– যখন কোনো মানুষ একটা পাথর ছোঁড়ে, সেটা যে নীচে পড়ে যায় তার কারণ, কোনো দৈত্য সেটাকে তলা থেকে টানে। এই রকম অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা মানুষ দেয়। একটা ভূত পাথরটাকে টেনে নামায়, এটা বাইরের ব্যাখ্যা – ও ব্যাখ্যা বস্তুটার ভেতরে নেই। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ যে ব্যাখ্যা দেয় তা রয়েছে পাথরটার মধ্যেই। আধুনিক চিন্তাধারার মধ্যে সর্বত্র এই ভিতরের ব্যাখ্যা আবিষ্কারের প্রবণতা দেখা যায়। এক কথায় বলতে গেলে, বিজ্ঞান দেখিয়ে দেয় – কোনো জিনিষের ব্যাখ্যা তার প্রকৃতির মধ্যেই আছে; বিশ্বজগতে কি ঘটছে তার ব্যাখ্যার জন্য কোনো বাইরের জিনিস বা বাইরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। রসায়ন–বস্তু ব্যাখ্যা করতে কোনো রাসায়নিকের ভূত–প্রেত বা দত্যি–দানা বা ঐ জাতীয় কোনো কিছুর দরকার হয় না। পদার্থবিদ্ বা অন্য বৈজ্ঞানিকদেরও তার দরকার হয় না। বিজ্ঞানের এই একটি লক্ষণ আমি ধর্মে প্রয়োগ করতে চাই। এই গুণ ধর্মের ক্ষেত্রে নেই বলে তারা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।"

স্বামিজীর বিজ্ঞানপ্রীতি, কিংবা অদ্বৈত বেদান্তপ্রীতি তাঁকে অতঃপর বিশ্বজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন সৃষ্টিকর্তা–ভগবানকে কুসংস্কারের বিষয় বলে ঘোষণা করার সাহস দিয়েছে। "একটি পুরণো ধর্মীয় ধারণা রয়েছেঃ এক সাকার ভগবান আছেন যিনি বিশ্বজগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন...! তিনি নিজের ইচ্ছায় এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনি এই পৃথিবীর শাসক। ... এই সর্বশক্তিমান ভগবান আবার পরম করুণাময়, যদিও পৃথিবীতে বৈষম্যের সীমা নেই।"

স্বামিজীর বক্তব্য – বিশ্বসৃষ্টির দায় কোনো সিংহাসনে উপবিষ্ট দণ্ডধারী ঈশ্বরের উপর না চাপানোই ভালো। উক্ত ঈশ্বর একটা বড়োসড়ো মানুষ ভিন্ন আর কেউ নন। তাঁর উপর নির্ভর করতে গিয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তির ধাক্কায় ধর্মগুলো ধ্বসে পড়ছে।

ভগবান বাইরে থেকে বসে জগৎ বানিয়েছেন – এটা যদি বাইরের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু মানে না হয়, তাহলে খ্রীষ্টীয় সৃষ্টিতত্ত্বের ঐ অংশটি স্বমিজীর কাছে কি গভীর হাসির বিষয় হবে যা বলেছে – এই পৃথিবী ৬ হাজার বছর আগে তৈরী হয়েছিল। "সৃষ্টির মানে কি – 'কিছু ছিলনা'র ভিতর থেকে কিছু বেরিয়ে আসা? ৬হাজার বছর আগে শ্রীভগবান শুভ প্রভাতে জেগে উঠে

পৃথিবীটা তৈরী করে ফেললেন? তার আগে তিনি কি করছিলেন–লম্বা নিদ্রা মারছিলেন?"

সাকার ভগবান যদি তাঁর 'ইচ্ছা'–কারখানা থেকে জগৎ সৃষ্টি না করে থাকেন, তাহলে তাঁর কাছে হাজার রকম প্রার্থনা হাজির করাও হাস্যকর। স্বামিজী সাকার ভগবানের প্রয়োজনীয়তাকে উড়িয়ে দেননি। তাকে আপেক্ষিক জগতে নিরাকার ব্রহ্মের সর্ব্বোচ্চ অভিব্যক্তি বলে মেনে নিয়েছেন। তুলনা দিয়ে বলেছেন– সে ভগবান কাদা মাটির বিরাট হাতীর মত, যা দিয়ে ইঁদুরের মত মানুষও তৈরী। "কিন্তু জলের মধ্যে রাখলে দুইই কাদা হয়ে যাবে। দুইই মাটি হিসাবে এক, কিন্তু ইঁদুর বা হাতী হিসাবে দুইয়ের মধ্যে চিরদিন পার্থক্য থাকবে।"

এই ধারণা মনে রেখে যদি কেউ সাকার ভগবান বা নিরাকার সগুণ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, স্বামিজীর আপত্তি নেই। নচেৎ মুল সত্যরূপী ঈশ্বর– যিনি সকল কিছুর মধ্যে ওতঃপ্রোত, তাঁর কাছে প্রার্থনার– বিশেষতঃ স্থূল ঐহিক জিনিষের প্রার্থনা – কী হাস্যকর। আরও হাস্যকর তাঁর গুণাবলীর নামাবলী পড়ে (এবং পরে) তাঁর খোসামোদ করা।

"ঐসব প্রার্থনার অর্থহীন ভাবগুলি নিম্নস্তরের ঐ প্রার্থনাগুলি – যেগুলি আমাদের মনের সর্বপ্রকার তুচ্ছ কামনার অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয় – ঐগুলি মনে হয় বিদেয় হবে। মাথামুণ্ড আছে এমন কোনো ধর্ম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে দেয় না–বলে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করো। তাই স্বাভাবিক। রোমান ক্যাথলিকরা সেন্টদের কাছে প্রার্থনা করে। নচেৎ ঈশ্বরকে বলা – আপনি বাতাস বইয়ে দিন, বৃষ্টি ঝরিয়ে দিন, আমার বাগানে ফল ফলিয়ে দিন, কিংবা বাল্যকালের প্রার্থনা – হে ভগবান, আমার মাথাধরা সারিয়ে দিন – কী উদ্ভট!"

"এই পৃথিবী আমার ভোগের জন্য তৈরী হয়েছে–এটা নির্বোধের স্বার্থপর ধারণা। আহাম্মক বাপ মা ছেলেদের প্রার্থনা করতে শেখায় – 'হে প্রভু! তুমি আমারি তরে সূর্য তৈরী করেছ, চন্দ্র তৈরী করেছ' – যেন এইসব শিশুর জন্য চন্দ্র সূর্যের খেলনা তৈরী করা ছাড়া প্রভুর আর কোনো কাজকর্ম নেই। শিশুদের এইসব আহাম্মকি কদাপি শেখাবে না। তারপর আবার কতকগুলি লোক আছে যারা অন্যভাবে নির্বোধ। তারা আমাদের শেখায় – এইসব জন্তু জানোয়ারকে তৈরী করা হয়েছে যাতে আমরা ওগুলিকে মেরে খেতে পারি – এই পৃথিবী মানুষের উপভোগের জন্য সৃষ্ট। পুরো আহম্মকি। তাহলে তো একটা বাঘও বলতে পারে–'মানুষগুলো আমারই পেট ভরানোর জন্য জন্মেছে', এবং সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারে – 'হে প্রভু, কি দুষ্ট সেই মানুষগুলি যারা আমার

উদর পূর্তির জন্য আমার কাছে স্বেচ্ছায় হাজির হয় না। প্রভু, ওরা তোমার নিয়ম ভাঙছে। তুমি ওদের সুমতি দাও।'

"মনে রেখো, পৃথিবী যদি আমার জন্য তৈরী হয়, আমরাও পৃথিবীর জন্য তৈরী হয়েছি।"

স্বর্গের দেবতারা, যাঁদের কাছে প্রার্থনাদি করা হয়, তাঁরা স্বামিজীর কাছে সবসময় খুব বেশী মর্যাদা লাভ করেন নি। ঐসব দেবতা আকাশের সুখের ওয়েটিং রুমে বসে আছেন, খানাপিনা, নাচা গানায় মোহিত হয়ে। এঁরা সৎকর্মের জন্য ঐ অবস্থা লাভ করেছেন-চিরদিন ওখানে থাকবেন এমন নয়। "দেবতাদের রাজা ইন্দ্র - এই 'ইন্দ্রত্ব' একটা অবস্থার নাম-যে অবস্থা হাজার হাজার মানুষ লাভ করেছে।" "জীবরা স্বর্গে যায়, সময়টা ভালই কাটায়। কেবল দুঃখ যখন দৈত্যরা মাঝে মাঝে খেদিয়ে দেয়। সব পুরাণেই দেখা যায়-দেব দৈত্যে মহা লড়াই; দৈত্যরা লড়াইয়ে জেতে কখনো লখনো। দেখা যায়, দৈত্যরা দেবতাদের মত বজ্জাতি করে না। যেমন ধরা যাক, সকল পুরাণের দেবতারা নারীলুব্ধ।" "পুরনো দেবতারা বিচিত্র, উদ্ভট, সশব্দ, যুদ্ধব্যস্ত, মদ্যপানে এবং গোমাংস ভোজনে নিরত - মাংসপোড়ার গন্ধে এবং কড়া মদের উপচারে তাঁদের সমূহ উল্লাস। ইন্দ্র মাঝে মাঝে এমন টানতেন যে, পপাত ধরণীতলে, মুখে বিজ্ বিজ্ কথা শুধু।"

জগতের অধিকাংশ ধর্ম সত্যান্বেষণ ছেড়ে যুক্তিবিরোধী বিচিত্র ধারণার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। সমস্ত রকম গোঁড়ামি বজায় রেখেও হঠাত 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের' জন্য চেঁচামেচি শুরু ক'রে দেয়। বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের অর্থ – গোঁড়াদের কাছে – তাদের খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে ভাই-পাতানো। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের জন্য গণ্ডগোলকে স্বামীজী একটি কৌতুক কাহিনী দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন -

"মদ খাওয়া ভারতে খুব পাপ কাজ। দুই ভাই এক রাত্রে ঠিক করল- গোপনে মদ খাবে। তাদের খুড়ো খুব রক্ষণশীল - পাশের ঘরেই তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। মদের ভাঁড় হাতে ধরেই তারা পরস্পর বলে নিল - 'একদম চুপ, খুড়োর ঘুম ভেঙ্গে যাবে।' তারপর তারা খাওয়া শুরু করল। খেয়ে যাচ্ছে আর বলছে- 'একদম চুপ, খুড়োর ঘুম ভেঙ্গে যাবে।' ক্রমেই তাদের চেঁচানি বাড়তে লাগল - পরস্পর পরস্পরকে চেঁচিয়ে চুপ করাতে লাগল। ফলে খুড়োর ঘুম ভাঙল - তিনি এসে দেখলেন, দুজনে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, 'একদম চুপ - খুড়োর ঘুম ভেঙ্গে যাবে।'

স্বামিজী বললেন, আমরা সবাই ঐ মাতালগুলোর মতো – চোখ বুজে কেবল চেঁচিয়ে যাচ্ছি–বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব চাই।

সব ধর্মেই 'প্রেরণা'র দাবিদার রয়েছে – সে সম্পর্কে স্বামিজীর মনোভাবের কথা আগেই বলেছি। এখানে ঐ বিষয়ে তাঁর একটি তামাশা গল্পের কথা বলে নিতে পারি।

স্বামিজীর এক বন্ধুর অতি সুন্দর একটি ছবি ছিল। এক ব্যক্তি, কিছুটা ধর্মঘেঁষা এবং অত্যন্ত ধনী – তাঁর নজর ছিল ছবিটির উপর। তিনি একদিন স্বামীজীর বন্ধুর কাছে এসে বললেন, 'আমি একটা বিশেষ প্রেরণা পেয়েছি – আমি ঈশ্বরের বাণী শুনেছি।' "প্রভুর কী বাণী?"– স্বামিজীর বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন। ভদ্রলোক বল্লেন – 'সে বাণী হল–অবশ্যই আমাকে ঐ ছবিটি দিতে হবে।' স্বামিজীর বন্ধু কম যান না। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, 'ঠিক বলেছেন। আহা কি অপূর্ব! আমিও একই প্রেরণার বাণী পেয়েছি। ঈশ্বর ছবিটি আপনাকে দেবার জন্য আমাকে সত্যই আদেশ দিয়েছেন। আর হাঁ, আপনি নিশ্চয় চেকটাও এনেছেন।' 'চেক – কিসের চেক' – সবিস্ময়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন। 'আহাঃ, তাহলে তো আপনার প্রাপ্ত বাণী ঠিক নয়! আমি বাণী শুনেছিলাম – এক লাখ ডলারের চেক যে ভদ্রলোক আনবেন তাকেই তুমি ছবিটা দিয়ে দেবে। আপনি মশাই আপনার পাওয়া বাণী খাঁটি প্রমাণ করতে আগে চেকটা আনুন।'

সুতরাং – বাণীর ধাক্কায় বাণীর পলায়ন!!

ধর্ম কোথায়? পুরনো প্রশ্নে আবার ফিরে আসছি। হাসির আঘাত দিয়ে, বিদ্রূপের তরবারি চালিয়ে স্বামিজী পথ পরিষ্কার করতে চেয়েছিলেন – সত্য ধর্মের মন্দিরের। সৃষ্টির মায়া আচ্ছন্ন করে রাখে সবকিছু – সত্যের সামনে ঝুলছে সেই যবনিকা – স্বামিজী বললেন – মায়া দিয়ে মায়াকে ভাঙো। অনেক গভীর উপমা ব্যবহার করলেন কথাটা বোঝাতে – তারপর হঠাৎ একটা গল্প মনে পড়ে যেতে হেসে ফেল্লেন – গল্পটাও বললেন এই সূত্রে–

হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের কাছেই শৃগাল অশুচি জীব। কুকুরও তাই। এরা যদি খাবার ছুঁয়ে ফেলে তাহলে সে খাবার ফেলে দিতে হয়। একবার একটি মুসলমানের ঘরে শৃগাল ঢুকে আহার্যের খানিক খেয়ে পালিয়ে যায়। লোকটি বড় দরিদ্র, অনেক কষ্টে কিছু ভাল খাবার বানাতে পেরেছিল, হায়, তাও নষ্ট করে দিল হতচ্ছাড়া শিয়ালটা। খাবারটা ফেলে দিতে হয়–কিন্তু ফেলে দেয় বা কি করে – এত কষ্টের খাবার! কী করা যায়। এখন মোল্লা যদি কোনো পথ বাতলে দিতে পারে। তখন সে মোল্লার কাছে গিয়ে ঘটনাটা বলে বিধান চাইলে।

খুব দুঃখ করতে লাগল সেই সঙ্গে –'এত গরীব আমি – কত সাধ করে খাবার তৈরী করেছিলাম – একদিন ভালমন্দ কিছু পেটে যাবে – আর আমার বরাতে এই ঘটল! গরীবের নসিবই এই। এখন আপনি যা করেন।' মোল্লা লোকটির কথা শুনে একটু ভাবল, তারপর বলল, মাত্র একটিই উপায় আছে–যদি তা করতে পারো সব দিক রক্ষা হয়।' 'কী সে পথ, বলুন মোল্লা সাহেব' – লোকটি ব্যাকুল হয়ে বলে। মোল্লা বললেন, 'তোমাকে প্রথমতঃ একটা কুকুর জোগাড় করতে হবে। তারপর সেই কুকুরটাকে নিয়ে গিয়ে যে থালা থেকে শিয়ালটা খেয়েছে – সেই থালার খাবার খানিকটা কুকুরকে খাওয়াতে হবে। তাহলেই কাম ফতে।' দরিদ্র লোকটি বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এক শেয়ালে রক্ষা নেই, তার উপর আবার কুকুর! মোল্লা তখন ব্যাখ্যা করে দেন–'শিয়াল কুকুরের নিত্য ঝগড়া। সুতরাং শিয়ালে খাওয়া খাবার এবং কুকুরে খাওয়া খাবার, দুইই যখন তোমার পেটে যাবে–তখন সেখানে ঝগড়া করে তারা কাটাকাটি হয়ে সমান হয়ে যাবে, ফলে খাবার আর অপবিত্র থাকার সুযোগ পাবে না–বুঝলে বোকচন্দর?'

এইসব গভীর বিষয় নিয়ে স্বামিজী যখন তামাশা করছিলেন তখন গভীর ভাবে বিষন্ন ছিলেন। এই পৃথিবীতে ধর্মের কী চেহারা দাঁড়িয়েছে। ধর্ম – স্বামিজী বারবার বলতে থাকেন – এখন সৌখীন ভদ্রমহিলার ড্রয়িংরুমের জাপানী আসবাব। "আমার প্রেয়সীর বসার ঘরে পৃথিবীর সবরকম সজ্জাদ্রব্য রয়েছে – কেবল একটি জাপানী ফুলদানির অভাব। ওটি না থাকলে সমাজে মুখ রক্ষা হয় না। ওটি ওঁর চাই–ই।" মানে ওঁর সাত পাঁচ কাজ আছে – এ পার্টি ও পার্টি, কত সাংস্কৃতিক সভা, ইত্যাদি – এই সঙ্গে একটু ধর্মের ট্র্যাঙ্কুলাইজার না হলে কি চলে?

এর মধ্যে আধুনিক পৃথিবীতে কোথায় সেই ব্যাকুলতা ঈশ্বরের জন্য, যা ধাবমান অগ্নির মত তাড়িত করে ফেরে মানুষকে? স্বামিজী এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কথাবার্তা স্মরণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন – 'কোটিতে একজনও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না।' স্বামিজীর বিস্ময়ের শেষ থাকে না – 'সে কি? সত্যি নাকি? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বলেন – 'ধর্, এ ঘরে একটা চোর রয়েছে, আর ও ঘরে রয়েছে একতাল সোনা; চোর সেটা জানতে পেরেছে; দু'ঘরের মধ্যে রয়েছে একটা পাতলা পর্দা – এই অবস্থায় চোরটার মনের ভাব কিরকম হবে?' 'কেন, চোরটা সারারাত ছটফট করবে – একটু ঘুমোতে পারবে না – কেবলই ভাববে কি করে সোনার তালটা হাতানো যায়' – স্বামিজী স্বতঃই বলেছিলেন। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন –তাহলে তুই কি মনে করিস –ঈশ্বরে বিশ্বাস

করেও মানুষ তাঁকে পাবার জন্য উন্মাদ না হয়ে পারে? মানুষ যদি সত্যই বিশ্বাস করে – ঈশ্বর অমৃতসাগর, এবং সেখানে যাওয়া যায় – তাহলে সেখানে যাবার জন্য সে পাগলের মত দৌড়বে না?

স্বামিজী জেনেছিলেন – ঈশ্বর কী বস্তু। তাই তিনি ঈশ্বর বিষয়ে বয়স্ক মানুষের বালোচিত প্রশ্নে হাসি সামলাতে পারেননি। ঈশ্বর কি শিশুর লোভের মেঠাই? বাল্যকালে স্কুলে একবার একটা ছেলের সঙ্গে স্বামিজীর মারামারি হয়ে যায় মিষ্টি খাওয়া নিয়ে। সে ছেলেটির গায়ের জোর ছিল বেশী, জোর করে সে মিষ্টি ছিনিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলে। তখন তাঁর মনে হয়েছিল – পৃথিবীতে অতবড় দুষ্ট আর কেউ নেই। বড় হয়ে যদি কোনোদিন হাতে ক্ষমতা পাই, আগে ওটাকে শায়েস্তা করব। স্বামিজী বললেন, শিশুর জগৎ এই খাওয়া দাওয়া, খেলনা-খেলার জগৎ। পৃথিবী ঐ রকম খাওয়া দাওয়া ভোগবিলাসের আকাঙ্খায় ভরা বয়স্ক শিশুতে পূর্ণ। এরা ভাবে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যদি সোনার দিন আসে তখন চারিদিকে কেবল থরে থরে খাবার সাজানো থাকবে। রেড ইণ্ডিয়ানরা যেমন মনে করে – সুখের পৃথিবীতে কেবল চারিদিকে শিকারের বন। এই ধরনের ইন্দ্রিয়জগতে মগ্ন মানুষ প্রশ্ন করে – ধর্ম আমাকে কি খাবার দেবে? ব্রহ্মজ্ঞান পৃথিবীর কোন উপকার করবে?

স্বামিজী বললেন-"ধর্ম রুটি খেয়ে বাঁচে না, বা বাড়ীর মধ্যে বাস করে না। ধর্মের বিরুদ্ধে অবিরত এই অভিযোগ শোনা যায় – ধর্ম আমাদের কোন্ ভাল করতে পারে? ধর্ম কি দারিদ্র দূর করতে পারে? ধরা যাক, তা পারে না, কিন্তু তার দ্বারা কি ধর্মের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়? ধরা যাক, তুমি জ্যোতিঃ শাস্ত্রের কোনও তত্ব প্রমাণ করতে চাইছ – তখন একটি শিশু উঠে দাঁড়িয়ে বলল – এটা কি আমাকে পিঠে এনে দেবে? তুমি বললে, না, তা দেবে না। শিশুটি বলল, তাহলে ওসব বাজে কথা।"

স্বামিজী আরও তীক্ষ্ণ করে অন্যত্র বলেছেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে নাকি পৃথিবীর উপকার করার ক্ষমতা হারিয়ে যায়, সুতরাং ওটার কোন প্রয়োজন? তার উত্তর শিশুও বলতে পারে – আমি বড় হয়ে গেলে আমার মার্বেল কোথায় যাবে কে জানে, আমার টক-মিষ্টি পিঠেও হারিয়ে যাবে, তাই আমি বড় হতে চাই না – শিশুর এই কথাটা গ্রাহ্য হবে?

কিংবা অজ্ঞেয়বাদী ইঙ্গারসোলের কথাটা কি চরম উক্তি বলে স্বীকৃত হবে? ইঙ্গারসোল স্বামীজিকে বলেছিলেন – আমি এই একটি জীবন পেয়েছি – তাকেই সর্বাংশে উপভোগ করে নেওয়া দরকার – হাতে আমার একটিই লেবু –

একে সম্পূর্ণ নিংড়ে নেব। স্বামিজী বলেছিলেন – লেবু নিংড়াবার আরও ভালো কৌশল আমার জানা আছে। আমার কোনো ব্যস্ততা নেই – আমি ধীরে সুস্থে নিংড়াতে পারি – কেবল একটি জীবনই রস নিষ্কাশনের জন্য আমি পাইনি – আমার অনেক জন্ম; অনেক জীবন।

স্বামিজী দেখলেন–জীবন মৃত্যুর দুই প্রাচীরে মাথা ঠুকে এধার–ওধার দৌড়চ্ছে যারা, তারা তারই মধ্যে প্রাণপণ লোভে খাবলে খাবলে খেয়ে নিতে চেষ্টা করছে – এরা ধর্মের নিত্য জীবন থেকে কত দূরে! খণ্ড সীমার মধ্যে যে চেহারাটা সে পেয়েছে – তাকেই মাঝে মাঝে আয়নায় দেখে নিয়ে মুগ্ধ হয়, গর্বিত হয়, ভাবে, কী ব্যক্তিত্ব আমার। তারপর আতঙ্কিত হয় যখন শোনে ধর্মের অর্থ নিখিল সত্তায় ব্যক্তিসত্তার নিমজ্জন। হায়, তাহলে আমার ব্যক্তিত্বের কি হবে? "ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য বস্তুটি কি?" স্বামিজী প্রশ্ন করলেন– "শিশুর গোঁফ নেই – বড় হলে তার গোঁফ দাড়ি হবে – শিশুটি এক্ষেত্রে আপত্তি করতে পারে, আমার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে গেল! শরীরের নাম যদি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য হয় – তাহলে একটা চোখ কানা হয়ে গেলে, বা একটা হাত কাটা পড়লেও তো বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যাবে! একটা মাতাল বলতে পারে, আমি মদ ছাড়ব না, তাতে আমার বৈশিষ্ট্য নষ্ট হবে – চোর ভাবতে পারে, চুরি ছাড়ব না, তাতে ব্যক্তিত্ব হারিয়ে যাবে!"

স্বামিজী বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে ভাবলেন – "এরা জানে না, শরীরটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কুসংস্কার।" এই কুসংস্কারই ব্যক্তিত্ব নাম নিয়ে বরসজ্জায় হাজির হয় আমাদের কাছে। স্বামিজীর কাছে ঈশ্বরের শরীরও কুসংস্কার – কম কুসংস্কার নয় ঈশ্বরের গুণ কল্পনা করা। আপেক্ষিক জগতে থাকার সগুণ ইশ্বর মূর্তি তিনি মানতে রাজী ছিলেন, কিন্তু সগুণ নিরাকার ঈশ্বরের কল্পনা তাঁকে সদাই হাসিয়েছে। তাঁর মনোভাব – বাপু, ঈশ্বর যখন তোমাকে দুহাত তুলে দিচ্ছেন, আর দুপায়ে তোমার শত্রুকে পিষছেন, তখন তাঁকে হাত পা থেকে বঞ্চিত করাটা কি ভদ্রতাসঙ্গত? ঈশ্বরক্ষমতায় যদি এত বিশ্বাস, তাহলে মেনে নাও না কেন – নিরাকার সরবরাহ–গহ্বর হওয়ার ক্ষমতা ঈশ্বরের যেমন আছে, তেমনি নিজের হাত পা তৈরী করার ক্ষমতাও তাঁর আছে।

সুতরাং আপেক্ষিক জগতে স্বামিজী নতজানু হতেন সর্বত্র। যেখানেই যথার্থ অনুরাগের সঙ্গে ঈশ্বরকে স্মরণ করা হয়–সেখানেই তাঁর প্রণাম। এক খ্রীষ্টান মহিলার সঙ্গে গির্জার মধ্যে গিয়ে খ্রীষ্টমূর্তির সামনে নত হয়ে তিনি বলেছিলেন– এই একই প্রভুকে তুমি এবং আমি উভয়েই উপাসনা করি। তিনি বলেছিলেন–

“অতীতের সকল ধর্মকে আমি স্বীকার করি। ঐ সকল ধর্মের মানুষ ঈশ্বরকে যে রূপে উপাসনা করেছে-তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি উপাসনা করি। মুসলমানের সঙ্গে আমি মসজিদে যাব; খ্রীষ্টানের সঙ্গে গির্জায় গিয়ে ক্রুশচিহ্নের সামনে নতজানু হব; বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে প্রভু বুদ্ধের চরণাশ্রয় নেব; তাঁর অষ্টাঙ্গিক মার্গকে গ্রহণ করব; আমি অরণ্যে গিয়ে হিন্দুর সঙ্গে ধ্যানলীন হয়ে সেই আলোকদর্শন করবার চেষ্টা করব, যা সকল হৃদয়কে আলোকিত করছে।”

“আমি কিন্তু থামব না। ঐ সমস্ত কিছু করার পরেও আমি হৃদয় উন্মুক্ত রাখব ভবিষ্যতের জন্য। ঈশ্বরের রচনা কি শেষ হয়ে গেছে? নাকি অবিচ্ছিন্নভাবে তিনি উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছেন? অপূর্ব সেই গ্রন্থ – যাতে মুদ্রিত রয়েছে পৃথিবীর সকল আধ্যাত্মিক প্রকাশ। বাইবেল, বেদ, কোরান এবং অন্য পবিত্র গ্রন্থগুলি ঐ মূল গ্রন্থের কিছু পৃষ্ঠা – আরও কত পৃষ্ঠা আছে উন্মোচিত হবার অপেক্ষায়-।”

বেদ-বাইবেল কোরান – মানুষের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী। পৃথিবীতে মানুষ স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। তা শিশুর স্বপ্ন। স্বামিজীর মনে পড়েছিল অ্যালিসের অপূর্ব জগতের কথা। স্বামিজী বলেছিলেন, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড – তার মধ্যে দেখা যায় – খাপছাড়া ঘটনার পর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, আশ্চর্য ছবির পর ছবি, কিন্তু অসংলগ্ন – অথচ শিশুর কাছে সেগুলি অসংলগ্ন মনে হয় না, যেমন বয়স্ক মানুষ তার স্বপ্নের মধ্যে ঘটনাধারার কোনো অসঙ্গতি দেখেন না। অথচ সেগুলি অসংলগ্ন – শিশু দেখে বড় হয়ে, মানুষ দেখে স্বপ্নভঙ্গে। এই স্বপ্নেই আমরা দেবতার মূর্তি রচনা করে পূজা করছি – যতক্ষণ তার মধ্যে আছি – কী সত্য সেগুলি!

স্বামিজী ভারতে ফিরছিলেন, জাহাজে, দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণ সাঙ্গ করে। এক তরুণ আমেরিকান মিশনারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে গেল। মিশনারী ভদ্রলোক স্বামিজীকে আগে-ভাগে পছন্দ করেন নি, কারণ, স্বামিজী মুখে না বললেও এমন মহান রাজকীয় মর্যাদা সর্বাঙ্গে বহন করতেন যে, আমেরিকান গণতান্ত্রিক বোধকে তা আহত করত। তবু তাঁদের আলাপ এবং সৌহার্দ্য হয়ে গেল, কারণ মিশনারী মানুষটি মন খোলা রেখেছিলেন। তাঁদের মন বিশেষভাবে মিলেছিল একটি ক্ষেত্রে – যখন তাঁরা ক্ষুধিত মানুষের বেদনার কথা ভেবেছিলেন। মিশনারী লিখেছেন, “সেদিন রাত্রে আমরা একত্রে ডেকের উপরে পায়চারি করেছিলাম এবং গভীর বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম, যার মধ্যে ইংরেজ, আমেরিকান বা ভারতীয় ব্যাপার ওঠেনি – সেখানে শুধু বর্তমান ছিলেন আমাদের

ক্ষুধিত মানব ভ্রাতারা, আর এক মানবপুত্র, যাঁর উৎসর্গীকৃত রক্তধারা এখনো রয়েছে এশিয়ার বায়ু-আন্দোলিত বালুকারাশির মধ্যে কোনোখানে।"

মিশনারী আরও লিখেছেন – "বিবেকানন্দের মিষ্টিসিজম্ বিচিত্র আকর্ষণ আর বিস্ময়ের বস্তু। তাতে কোনো ভঙ্গি ছিল না। আমাদের কথোপকথন যখন আত্মার গভীর বস্তুগুলিকে স্পর্শ করত, করতই তা, তখন তাঁর ভারি চোখের পাতা ধীরে নেমে আসত, এবং আমারি সমক্ষে তিনি চলে যেতেন কোনো এক রহস্যলোকে, যেখানে আমার আমন্ত্রণ ছিল না।"

স্বামিজী কোথায় যেতেন – তা কি ব্যক্তি ভগবানের সান্নিধ্যে? নাকি নিরাকার ব্রহ্মলোকে? এবং কোথায় যাওয়াই বা মানুষের পক্ষে শ্রেয়? বিবেকানন্দ ও মিশনারীর মধ্যে পার্থক্য ছিল এইখানেই। মিশনারী বলেছিলেন, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যখন যেতে হবে, তখন সচেতন সেবা পূজা নিয়েই যাওয়া উচিত – হিন্দুর নিরাকার ব্রহ্ম নিমজ্জনের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। স্বামিজী শুনে চকিতে তাকিয়েছিলেন, কোনো কথা বলেননি।

জাহাজে শেষ রাত্রির কথা। সামনের ডেকে উভয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বিবেকানন্দ পাইপে ধূমপান করছিলেন – যা তাঁর 'একমাত্র বিলেতী পাপ।' তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন – দেখছেন, সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গবিস্তার – নবীন মিশনারীর মন ভারাতুর আগামী দিনের চিন্তায় – এক অপরিচিত জগতে তিনি অবতরণ করতে যাচ্ছেন। নীরব তিনি। স্বামিজীও তাই। দীর্ঘ স্তব্ধতার পর স্বামিজী যেন সহসা মনস্থির করলেন – এই তরুণ মিশনারী তাঁর ভারতের কোন ক্ষতি করবেন না। তিনি তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন।

"মহাশয়" – স্বামিজী বললেন – "ওরা ওদের বুদ্ধের কথা, কৃষ্ণের কথা, ওদের খ্রীষ্টের কথা বলে বলুক; কিন্তু আপনি আর আমি জানি যে, আমরা সকলেই সেই অদ্বৈতের অংশ।"

স্বামিজীর হাত স্থির হয়ে রইল মিশনারীর কাঁধে। সে হাত বন্ধুর। জোর করে সে হাত সরিয়ে দিতে পারলেন না মিশনারী। খানিক পরে স্বামিজীই তা সরালেন। তখন মিশনারী তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, বললেন–

"স্বামিজী, আপনার কথা আপনিই বলুন, কিন্তু আমার হয়ে বলবেন না। যে অদ্বৈতের কথা আপনি বললেন, তা নৈর্ব্যক্তিক। যদি তার মধ্যে নিমজ্জিত হইও, তবু তা অজ্ঞেয় থেকে যাবে। আমি যাকে জানি, ভালবাসি, তিনি ব্যক্তিগত – তিনি বাস্তব, অতি বাস্তব – স্বামিজী, তাঁর মধ্যেই রয়েছে সকল পূর্ণতা।"

পাইপটি এতক্ষণ নামানো ছিল, স্বামিজী চকিতে সেটি মুখে নিলেন – তারপর মিশনারী লিখেছেন–

"স্বামিজী তখন রেলিং ধরে ঝুঁকে ছিলেন – তাঁর যখন আঁখি পল্লব ধীরে ধীরে নামতে লাগল – বোঝা গেল বিবেকানন্দ দূর রাজ্যে প্রস্থান করেছেন।

"সেই রাত্রে বিবেকানন্দ কাকে চেয়েছিলেন – সকলই যেখানে এক – সেই অদ্বৈতকে, নাকি যে 'তিনি' সকলের মধ্যে আছেন, সেই পরম পিতাকে?"

সংবাদপত্রে রামকৃষ্ণের কথা

শ্রী সুধীরকুমার মিত্র

অবিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস, ও একদেশদর্শিতা এবং পরধর্মবিদ্বেষ, গোঁড়ামি ও সংশয়বাদকে দূর করে সার্বভৌম ধর্মভাবকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হন ১২৪২ সালের ৬ ফাল্গুন [১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬]। ভক্তিই মুক্তি – ত্যাগই শান্তি – এই দিব্যজ্ঞান জীবকে শিখিয়ে দয়াল ঠাকুর মাত্র ৫১ বছর ৫ মাস ২৫ দিন ধরাধামে অবস্থান করে ১২৯৩ সালের ৩১ শ্রাবণ [১৫ আগষ্ট, ১৮৮৬] লীলা সংবরণ করেন। তাঁর সম্বন্ধে অসংখ্য জীবনীগ্রন্থ বর্তমানে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেকালের সংবাদপত্রে তাঁর লীলাবসানের আগে ও পরে যা লেখা হয়েছিল, তা বিবৃত করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

রামকৃষ্ণদেব ভক্তিবীজ শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বপন করবার জন্য যে চেষ্টা করছেন, সেই সম্বন্ধে সর্বপ্রথম একটি সংবাদ The Indian Mirror পত্রে ১১ ডিসেম্বর, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। যথা:

Note – The Paramhansa of Dakshineswar is rousing the spirit of devotion and spreading the love of God among the educated classes in the city. Last evening there was a devotional festival at the house of Babu Rajendranath Mitter.

তাঁর সম্বন্ধে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ আগষ্ট 'ধর্মপ্রচারক' পত্রিকায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাঁর অংশবিশেষ এখানে উদ্ধারযোগ্য:

মহাত্মা রামকৃষ্ণ ।। গহন বনে কত সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া থাকে তাহা লোকসমাজ কিরূপে জানিবে? তাহারা বনজ, বনের শোভা বর্ধন করিয়াই বিজনে বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিয়াই বনের ফুল বনেই মিশিয়া যায়। ফুল যাঁহার

শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়, ফুল তাঁহারই সহিত হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইয়া দেয়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ ভগবৎ সাধন-কাননের একটি সুগন্ধ পুষ্প। পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য, কীর্তি আদি যে সকল উপায় দ্বারা লোক সকলকে সাধারণতঃ পৃথিবীতে বিখ্যাত ও পরিচিত করাইয়া দেয়, রামকৃষ্ণ ছন্দাংশেও তাহার ছায়া স্পর্শ করেন নাই। ইনি বনের ফুল বনে ফুটিয়াই বনদেবতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছেন। সৌভাগ্যবান পুরুষেরাই তাহার সঙ্গ-সৌগন্ধ লাভে আনন্দিত হইয়া থাকেন।.....

মহাত্মা রামকৃষ্ণ এক্ষণে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে এ প্রদেশে প্রসিদ্ধ। ইনি গৌরিক কৌপীনধারী নহেন, ইহার মস্তক মুণ্ডিত নহে, অথচ ইহাকে কেন লোকে পরমহংস বলে বুঝিয়াছেন? ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্যে পরমহংস। আশ্চর্য ইহার ভাব, আশ্চর্য ইহার প্রকৃতি। যদি কেহ তাঁহার নিকট ভগবানের গুণগান করেন, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে তাঁহার সংসার বিলোপ হইয়া যায়। শরীর নিঃস্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমণীতে রক্ত চলাচল শক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। আবার তাঁহার কর্ণে প্রণবধ্বনি শুনাইলে পুনশ্চেতনা লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার কথাগুলি সরল, এত মধুর ও এত হৃদয়গ্রাহী যে তৎশ্রবণে পাষাণ হৃদয়েও ভক্তির বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তাঁহার নিকটে কিয়ৎক্ষণ বসিলে কথায় কথায় এত উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায় যে, বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও তত্তাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবন একখানি জীবন্ত গ্রন্থবিশেষ, কল্যাণপ্রার্থী মাত্রেই অধ্যয়নের উপযোগী। তাঁহার বিষয় অনেক বলিবার আছে। অদ্য স্থানাভাবে তাহা আর প্রকটিত করিতে পারিলাম না। সময়ে সময়ে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। (শ্রাবণ পূর্ণিমা, ১৮০৬ শকাব্দ)।

এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বহু সংবাদ তৎকালীন সুলভ সমাচার, The New Dispensation, The Indian Mirror, পরিচারিকা, কুশদহ, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২৮ জানুয়ারী ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম 'ধর্মতত্ত্বে' (১৬ মাঘ, ১৮০৭ শকাব্দ) ঠাকুরের অসুখের খবর প্রকাশিত হয়। খবরের অংশবিশেষ এইরূপঃ

সংবাদ ।। আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মহাশয়ের অত্যন্ত সঙ্কট রোগ। তাঁহার কন্ঠনালীর ভিতর ক্ষত হইয়া বক্ষদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি সময়ে সময়ে রক্ত বমন করিয়া থাকেন। কোন কোন দিন দুই সের আড়াই সের রক্ত মুখ দিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার গলার স্বর একেবারে বন্ধ হইয়াছে। দুই তিন মাস ভয়ানক কষ্ট

পাইতেছেন। চিকিৎসকগণ নিরাশ হইয়াছেন, সম্প্রতি আর কোনরূপ চিকিৎসা হইতেছে না, দিন দিনই অবস্থা মন্দ দেখা যাইতেছে। পরলোকের জন্য তাঁহাকে এইক্ষণ বিশেষরূপে প্রস্তুত হইতে হইয়াছে। কিছুকাল হইতে তিনি কাশীপুরস্থ এক বাগানবাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন। বর্তমান সময়ে ইহার ন্যায় সাধুপুরুষ এদেশে নাই। বঙ্গদেশের উপর কি অভিসম্পাত হইয়াছে, ইনিও বুঝি অচিরেই যাত্রা করিবেন। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইবে।

এই সংবাদ প্রকাশিত হবার তিন মাস পর 'ধর্মতত্ত্বে' ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আরোগ্যলাভ করছেন বলে ২৮ এপ্রিল, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

সংবাদ ।। ... দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মহাশয় অপেক্ষাকৃত অনেক আরাম হইয়াছেন, ডাক্তারগণ আবার সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবার আশা দিতেছেন।

তারপর ৩১ শ্রাবণ, ১২৯৩ [১৫ আগষ্ট, ১৮৮৬] রবিবার রাত্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অমরধামে যাত্রা করেন। এই সংবাদ পরদিবস 'ধর্মতত্ত্বে' ১ ভাদ্র, ১৮০৮ শক [১৬ আগষ্ট, ১৮৮৬] প্রকাশিত হয়। The Indian Mirror পত্রে ১৯ আগষ্ট শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্যের বিশদ বর্ণনা সহ একটি সংবাদও প্রকাশিত হয়।

সংবাদ ।। আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে লিখিতেছি যে, পরমযোগী ও ভক্ত দক্ষিণেশ্বরের ভক্তি-ভাজন শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গতকল্য রাত্রি ১ ঘটিকার সময় কাশীপুরে ঐহিক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি বহুকাল হইতে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। এইক্ষণে সমুদায় রোগ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃত ধামে চলিয়া গেলেন। বঙ্গভূমি একটি সাধু রত্ন হারাইল। অদ্য অপরাহ্ন ৫টার সময় বরাহনগরের ঘাটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইবে।

Late Ramakrishna Paramahansa.-

The much respected Ramakrishna Paramhansa of Dakshineswar who was ailing for some months passed from scrofula, breathed his last at about 1 A.M. on Sunday, the 15th instant. The disease had gradually undermined his health, but it was not expected that the end would come so soon. The next evening his body was removed to the burning ghat at Cossipore. The funeral procession was followed by a large number of followers, friends and Admirers who had hastened to the spot to have a last look at his face. The party

entered the ghat chanting hymns in praise of Hari. The cot containing the body was then laid down on the side of the river and all the men sat down on the bare ground, forming a circle around the dead body. Babu Troylokhyo Nath Sanyal the singing minister of the Brahmos, sang a few songs suited to the occasion. After the songs had softened to some extent the hearts of the sorrowing multitude, the body was placed on the funeral pyre and in an hour and a half the burning was complete. A few bones only were taken to be interred at a suitable spot.

রামকৃষ্ণের চিতাভস্ম একটি কলসীর মধ্যে রক্ষিত হয়। এক সপ্তাহ পরে [২৩ আগষ্ট ১৮৮৬] উহা কাঁকুড়গাছিতে প্রোথিত করার জন্য শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হয়। 'সুলভ সমাচার' ও 'কুশদহ' পত্রে ১২ ভাদ্র, ১২৯৩ [২৭ আগষ্ট ১৮৮৬] এ সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা এইঃ
"আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহা নিম্নে অবিকল লিখিলাম।

গত সোমবার [২৩শে আগষ্ট ১৮৮৬] প্রাতে নয়টার সময় সিমুলিয়া ষ্ট্রীটের ১৩নং ভবন হইতে সংকীর্তনসহ অনেকগুলি ভদ্রলোক স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অস্থিপূর্ণ তাম্রকলস লইয়া সমাদরের সহিত বাহির হইলেন। দলে অনুমান পঞ্চাশ জন ভদ্রলোক ছিলেন। অগ্রে খোল করতাল সিঙ্গাসহ বিডন ষ্ট্রীট থিয়েটারের কয়েকজন অভিনেতার একটি সংকীর্তনের দল, তৎপরে কতকগুলি সৌখিন যুবক পাখোয়াজের সহিত একটি নবরচিত সঙ্গীত করিতে করিতে চলিলেন। পরমহংস মহাশয়ের শিষ্যেরা ক্রমান্বয়ে উক্ত কলসটি মস্তকে করিয়া চলিতে লাগিলেন। ফুলের মালায় কলসটি সুসজ্জিত করা হইয়াছিল, উপরে বহুমূল্য ছত্র ধরা হইয়াছিল। পার্শ্বে আড়ানী যোগে বাতাস করা হইতেছিল, দুই দিক হইতে চামর ব্যঞ্জন করা হইতেছিল, এর পশ্চাতে নববিধানের প্রচারকদ্বয় অবনত মস্তকে গমন করিতেছিলেন। সিমুলিয়া হইতে কাঁকুড়গাছির ৮০ সংখ্যক উদ্যানে পোঁছিয়া একটি ইষ্টক নির্মিত সমাধি গহ্বরে কলসটি রাখিয়া পুষ্প অর্পণ পূর্বক অনেকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন, উদ্যানটি পত্র পুষ্প ও সামিয়ানায় সুশোভিত করা হইয়াছিল, তৎপরে বাবু যদুনাথ মিত্রের উদ্যানে উৎসব হইল।"

এ বিষয়ে 'ধর্মতত্ত্বে' ৩১শে আগষ্ট ১৮৮৬, ১৬ ভাদ্র যে দীর্ঘ সংবাদ প্রকাশিত হয়, তার শেষাংশ এইরূপঃ-

৯ই সোমবার পূর্বাহ্নে ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কাঁকুড়গাছিস্থ উদ্যানে পরমহংসের দেহভস্ম মহাসমারোহে প্রোথিত হইয়াছে। সে স্থানে অচিরেই একটি সুন্দর সমাধিস্তম্ভ স্থাপিত হইবার কথা আছে। বহু সংখ্যক ভদ্রসন্তান সংকীর্তন করিতে করিতে কাশীপুর হইতে ভস্ম সেখানে লইয়া যান। মধ্যাহ্নে তথায় তাঁহারা খেচরান্নাদি ভক্ষণ করেন। শুনিলাম প্রায় ৭শত লোকের আহারের আয়োজন হইয়াছিল। অপরাহ্নে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ও অপর ২/৩ জন সমাধিস্থল দেখিতে গিয়াছিলেন। সে স্থানে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন পরমহংসদেবের উক্তি পুস্তক পাঠ ও ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মাতৃবিষয়ক কয়েকটি সঙ্গীত করেন। শ্রবণে আহ্লাদিত হইলাম। রামচন্দ্র বাবু নাকি স্বীয় উদ্যান পরমহংসদেবের নামে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ ও কীর্তির জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন।

তাঁর দেহরক্ষার পঞ্চাশ বছর পর রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধনে (ফাল্গুন ১৩৪২) রামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে বাংলায় শ্রদ্ধাঞ্জলী দেন, তাঁর ইংরাজী অনুবাদ Prabuddha Bharat (February 1936) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার শেষ চার লাইন হচ্ছে–

তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে,
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

The manifold revealation of the joy of the Infinite has given form to a shrine of unity in your life wherefrom far and near arise salutations to which I join mine own.

মায়ের আগমনে **শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র (বারাণসী)**

বর্ষা গেল, শরৎ এলো, প্রকৃতির আজ সাজের বাহার!
একটি বছর পেরিয়ে গেলেই সময় হল মায়ের আসার।
দুঃখ-কষ্ট, করোনা-ক্লিষ্টে মায়ের হেথা সন্তান রয়।
দশ-প্রহরিণী শংকা-হারিনী মা আছেন, কিসের ভয়?

মহামারী দূরে যাবে মায়ের আশিস পাবার পর;
'মা' যে মোদের প্রাণের ঠাকুর, করতে পারি তাঁরে নির্ভর।
অপরাজিতা, শিউলি ফুলে মায়ের চরণ করব পূজন,
ঘোড়ায় চড়ে আসবেন মা, করছি মোরা তার আয়োজন।
মায়ের সাথে সবাই আসেন, মর্ত্য যে তাঁর পিত্রালয়,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আদি সব কিছুতেই দেন বরাভয়।
তাইত মোরা মা-কে মানি, দুঃখ কষ্ট রোগের ত্রাতা।
মায়ের সাথে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ মোদের ভ্রাতা।
দুঃখ দৈন্য রোগ মহামারী মায়ের আগমনে যাবেই দূরে।
বিশ্বাস নিয়ে করছি পূজন, আগমনী গান গাইছি সুরে।
মর্ত্যলোকে নানান বিঘ্ন, তাই মা র'বেন চারদিন ধরে
সবার মুখে ফুটবে হাসি, দুঃখ শেষে সুখের তরে।
এসো মাগো, জগৎ জননী, সন্তানেরে অভয় দিয়ো,
দোলায় চড়ে যাবার কালে ছেলেমেয়েদের প্রণাম নিও,
ঢাক ঢোল শঙ্খ ঘন্টায় জানাব তোমায় শ্রদ্ধাঞ্জলি,
বলবো সবাই 'আবার এসো', কুড়িয়ে নেব চরণ ধূলি।

আত্মবীক্ষণ **সুনন্দন ঘোষ**

যে শরীরটা কুড়ি কেজির রুকস্যাক নিয়ে গিরিশিরা পেরিয়ে যেত
সে আজ বাজারের থলে হাতে নিতে চিন্তা করে।
যে শরীরটা নিজের তিন বছরের শিশুকে বুকে বেঁধে
ঝুলন্ত লোহার দড়িতে উত্তাল পার্বতী নদী পার হয়েছে পাহাড়ীদের মত,
সে আজ কন্ডাক্টেড ট্যুরের বিজ্ঞাপন খোঁজে।

সময়ের চোরা স্রোত ধুয়ে নিয়ে গেছে জীবনের মসৃনতা।
রক্তে চিনি, চোখে ছানি, হাঁটুতে খিল।
স্বপ্ন তবু থেকে যায় অশ্বত্থের শিকড়ের মত।
মানালীর আকাশ নাগেরবাজারের জানলার ফ্রেমে
ধরা দেয় মেঘলা দিনে;
বর্ষার ছাঁটের সঙ্গে পুরীর সমুদ্র দোতলার বারান্দায়

DO NOT COPY

পাঠিয়ে দেয় কয়েক টুকরো ঢেউ।

স্কুলের বন্ধুরা গাল পাড়ে পিকনিকে যাবোনা বললে।
অফিসের বন্ধুরা গাল পাড়ে হোয়াটসঅ্যাপে উত্তর না দিলে।
ফটোগ্রাফির ক্লাসের ছেলেমানুষগুলোর সাথে
তাদের আধুনিক ভাষায়
কথা বলার অভ্যাস চলে।

এখনও কবিতা লেখা যায়,
এখনও ক্যামেরা ধরা যায়,
লকডাউনে টেবিল টপ ফটোগ্রাফি করে ফেসবুকে লাইক পাওয়া যায়।

এই তো ভাল থাকা বেশ!
কাবুল থেকে পালাতে গিয়ে ইউ এস প্লেন থেকে ক'জন ছিটকে গেল,
তা জেনে আমার কি হবে?
আফগানিস্থানে বোরখার দাম আজ ৫০০ থেকে বেড়ে ১৫০০ টাকা,
তা'তে আমার কি?

খেলা-মেলা, হোয়াটসঅ্যাপ-ফেসবুক নিয়ে
নিশ্চিন্তে থাকবো সবাই ---
যতদিন না মৌলবাদের বুলেট হৃদপিণ্ডকে
এফোঁড় ওফোঁড় করে যায়!!!

DO NOT COPY